নারী, রাজনীতি ও নির্বাচন:
প্রতিনিধিত্ব ও ক্ষমতায়ন

এডভোকেট রোখসানা খন্দকার
মোঃ মোর্শেদ আলম

কম্পিউটার ডিজাইন
মোঃ দিদার-উল হক রানা

স্বত্বাধিকারী
আবদুল মোমেন খান মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন (খান ফাউন্ডেশন)

প্রকাশকাল ঃ নভেম্বর ২০২০

সকল স্বত্ত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত। প্রকাশকের পূর্বানুমতি ব্যতীত এর কোনরূপ মুদ্রণ, এমনকি পুনঃমূদ্রণ অথবা কোন প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন করা যাবে না। কোন ব্যক্তি যদি এর সাথে সংশ্লিষ্ট মুদ্রণজনিত কোন বেআইনী কাজে জড়িত থাকেন তা দণ্ডণীয় ও ফৌজদারী অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে।

নারী, রাজনীতি ও নির্বাচন: প্রতিনিধিত্ব ও ক্ষমতায়ন

আবদুল মোমেন খান মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন (খান ফাউন্ডেশন) একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক, জনকল্যাণমূলক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। খান ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। "উন্নয়নের জন্য গণতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের জন্য উন্নয়ন" এই মূলমন্ত্রকে ধারণ করেই খান ফাউন্ডেশনের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি সাংসদ, বুদ্ধিজীবী, কার্যনির্বাহক, সুশীল সমাজ এবং তৃণমূল পর্যায়ের কৃষক, শ্রমিক, মহিলা বিশেষ করে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে একত্রিত করে দারিদ্র বিমোচন এবং উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিরলস প্রচেষ্টায় নিয়োজিত।

এদেশের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠীই নারী। খান ফাউন্ডেশন মনে করে, নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে একই সাথে মানব সম্পদের উন্নয়ন নিশ্চিত হয় এবং এক্ষেত্রে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী।

দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির পাশাপাশি এবং নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে নারী সমাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। তৃণমূল থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে রাজনীতির সাথে নারীর সম্পৃক্ততার কারণে রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর পদচারণা কিছুটা বেড়েছে। তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ, তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ণের চিত্র বিশ্লেষণের জন্য খান ফাউন্ডেশন এই গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করেছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য ঃ

"নারী, রাজনীতি ও নির্বাচন: প্রতিনিধিত্ব ও ক্ষমতায়ন" শীর্ষক গবেষণার উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে -

১) জাতীয় ও তুণমূল পর্যায়ে নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন পর্যালোচনার মাধ্যমে সামগ্রিক নারী ক্ষমতায়নের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া।

২) বর্তমান রাজনৈতিক পটভূমিতে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের সহায়ক পরিবেশ কতটুকু তৈরি হয়েছে তা নির্ধারণ করা।

৩) রাজনৈতিক দল এবং স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের একটি তুলনামূলক ধারণা পাওয়া।

৪) নাগরিক সমাজের মতে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠার বাধাসমূহ নির্নয়।

গবেষণা পদ্ধতি ঃ

এই গবেষণায় প্রধানত পরোক্ষ উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই গবেষণায় পরোক্ষ উৎস যেমন ওয়েব সাইট, স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের গবেষণা প্রতিবেদন ছাড়াও খান ফাউন্ডেশনের পূর্ববর্তী গবেষনা প্রতিবেদনের হালনাগাদকৃত তথ্য-উপাত্ত থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। খান ফাউন্ডেশনের গবেষনা দল কর্তক গবেষনা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। গবেষনাকালীন তথ্যের গুণগত মান বজায় রাখতে গবেষণা দলের সদস্যরা বিভিন্ন পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করেছেন।

সূচনা ঃ পৃথিবীতে শান্তি ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন নারী-পুরুষের সমঅংশগ্রহণ। নারী সমাজকে উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে দূরে রেখে মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্ভব নয়। সভ্যতার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য রাজনীতি, অর্থনীতি এবং নীতি নির্ধারণসহ উন্নয়নের সকল স্তরে নারীর অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। ইতোমধ্যে রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর পদচারণ নতুন সহস্রাব্দে অপরিহার্য বিষয় হয়ে উঠেছে। বিশ্বব্যাপী নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিষয়টি এখন বিশেষভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে। জাতীয় নীতি, আঞ্চলিক চুক্তি এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নারী ইস্যু ভিত্তিক সম্মেলনে যার প্রতিফলন ঘটছে। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের সুযোগ তৈরীর জন্য আনুষঙ্গিক বিষয়াদির ওপর দৃষ্টি দেয়া হচ্ছে বিশ্ব নীতিমালায়।

বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী হলেও রাজনীতিতে নারীরা এখনও বৈষম্যের শিকার। অনগ্রসর শ্রেণী হিসেবে চিহ্নিত নারীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত হলেও শ্রম-মজুরীর অসমবণ্টন থেকে শুরু করে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গন সর্বত্র এখনও নারী-পুরুষের সমঅধিকার নিশ্চিত হয়নি। কিন্তু দ্রুত বিশ্বায়নের ফলে আজ আমাদের দেশের নীতি নির্ধারকরাও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীদের সম্পৃক্ত করার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করছেন। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজন নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে সিদ্ধান্তগ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় তাঁদের সম্পৃক্ততা। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের নেপথ্যে যে বিষয়টি কাজ করছে তা হল উন্নয়ন প্রক্রিয়া এবং তার কার্যকর ফলাফলে বৈষম্যহীনভাবে জনসাধারণকে পূর্ণাঙ্গভাবে জড়িত করার প্রয়োজনীয়তা। কেননা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিচালনায় নারীর অংশগ্রহণ যত বেশি ঘটবে ততোই পরিকল্পনাগুলোর গুণগতমান বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক অধিকার অংশে অনুচ্ছেদ ২৮ এর ধারা ২-এ বলা আছে, রাষ্ট্র ও জনজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার থাকবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-৫ এ নারীর সমধিকার এবং তাদের ও কণ্যা শিশুর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। নারীর জন্য যে নতুন উন্নয়নের মডেল বিশ্বব্যাপী আলোচিত হচ্ছে, সেখানে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নসহ মূলত মোটা দাগে চারটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। বিষয়গুলো হলো: নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন; ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নারীর মালিকানা; মানসম্মত কাজের পরিবেশ এবং মজুরি, শান্তি ও ন্যায়বিচার বা ন্যায্যতা।
জাতীয় সংসদ ও নির্বাচন কমিশনের পাঠাগারে রাখা বিগত দশটি জাতীয় সংসদের নির্বাচন সংক্রান্ত নথিপত্র, সংসদের আইন ও নোটিশ শাখায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, দেশে পর্যায়ক্রমে নারী নেতৃত্ব বাড়লেও তাদের ক্ষমতায়ন বিষয়ে ভিন্নমত রয়েছে বিশেষজ্ঞদের। স্বাধীনতার পর প্রথম সংসদ নির্বাচনে কোন নারী সরাসরি ভোটে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হতে না পারলেও পরের নির্বাচনে দুজন নির্বাচিত হয়েছিলেন।

বর্তমান সংসদে ৭২ জন (সাধারন আসনে ২২ জন ও সংরক্ষিত আসনে ৫০ জন) নারী সদস্য রয়েছেন। এছাড়া মন্ত্রিসভায় নারী আছেন, প্রধানমন্ত্রী নারী, সাবেক প্রধান মন্ত্রী নারী, বিরোধী দলীয় নেতা নারী, এমনকি জাতীয় সংসদের স্পিকারও নারী। বাংলাদেশে সরকারের নীতি নির্ধারণে মন্ত্রীদের পরই যাদের ভূমিকা, তারা হলেন সচিব। এই সচিব বা আমলারাই নীতি নির্ধারণ এবং নীতি বাস্তবায়নে মূল ভূমিকা পালন করেন। আর সেখানে নারীদের অবস্থান দেখলে সহজেই বোঝা যাবে নীতি নির্ধারণ এবং বাস্তবায়নে নারীর অবস্থান। বর্তমান সরকারের প্রশাসনে সচিব পদমর্যাদায় কাজ করছেন মোট ৭৮ জন কর্মকর্তা। তাদের মধ্যে মাত্র সাত জন নারী সচিব। দুই জন ভারপ্রাপ্ত সচিব। সব মিলিয়ে বলা যায়, নারী সচিব রয়েছেন মাত্র নয় জন। শতকরা হিসেবে মাত্র ১১ ভাগ। নারী দিবসে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে মোট ১৩৪ জন কর্মকর্তার মধ্যে নারী ৩৫ জন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ৬৭ জনের মধ্যে নারী কর্মকর্তা ১২ জন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ৫৭ জন কর্মকর্তার মধ্যে নারী ৯ জন। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে ১১৬ জন কর্মকর্তার মধ্যে নারী ২৮ জন। ধর্ম মন্ত্রণালয়ে ২২ জন কর্মকর্তার মধ্যে নারী কর্মকর্তা তিনজন। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে ২৬ জন কর্মকর্তার মধ্যে নারী কর্মকর্তা চারজন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ৬৫ জন কর্মকর্তার মধ্যে নারী কর্মকর্তা ১৫ জন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে মোট ৩৮ জন কর্মকর্তার মধ্যে নারী কর্মকর্তা ৬ জন। খাদ্য মন্ত্রণালয়ে মোট ৪৬ জন কর্মকর্তার মধ্যে নারী কর্মকর্তা ১১ জন। অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের অবস্থা এরচেয়ে ভালো না। কোন মন্ত্রণালয়েই নারীদের অবস্থান শতকরা ২০ ভাগের বেশি নয়।

সরকারি এবং আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত পদের সংখ্যা ১০ লাখ ৯৭ হাজার ৩৩৪টি। এর মধ্যে নারীর সংখ্যা ৮৩ হাজার ১৩৩, অর্থাৎ শতকরা ৭ দশমিক ৬ ভাগ। উপসচিব থেকে সচিব পদ পর্যন্ত নারীদের সংখ্যা

গড়ে মাত্র ২ শতাংশ বা তারও কম। বিচার বিভাগে বিচারক পদের ১০ শতাংশ নারী হলেও হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি পদে এখনো কোন নারীকে দেখা যায়নি।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী, দেশের ৫ কোটি ৪১ লাখ কর্মজীবীর মধ্যে ১ কোটি ৬২ লাখ নারী। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের মধ্যে নারীর সংখ্যা ১৬ হাজার ৬৯৭ জন। বিদেশে বিভিন্ন পেশায় কর্মরত ৭৬ লাখ প্রবাসীর মধ্যে ৮২ হাজার ৫৫৮ জন নারী। বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রধান খাত তৈরী পোশাক শিল্পের ৮০ ভাগ কর্মীই নারী। আর দেশের ৯০ শতাংশ ক্ষুদ্রঋণ ব্যবহারকারীও নারী।

প্রসঙ্গত, ২০০৮ সালে দেশে নারী ভোটার ছিল ৪ কোটি ১২ লাখ ৩৬ হাজার ৫৪৯ জন এবং পুরুষ ভোটার ছিল ৩ কোটি ৯৮ লাখ ২২ হাজার ১৪৯ জন। অর্থাৎ ১০ বছর আগে পুরুষ ভোটারের চেয়ে নারী ভোটার ১৪ লাখ ১৪ হাজার ৪০০ জন বেশী ছিল। ২০০৮ সালের পর থেকে ভোটার হালনাগাদে নারী ভোটার ক্রমশ কমতে কমতে এখন পুরুষের সংখ্যা বেশি হয়ে গেছে। বর্তমান তালিকাতে দেশের ভোটার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯ কোটি ৯৮ লাখ ৯৮ হাজার ৫৫৩ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৫ কোটি ৩ লাখ ২০ হাজার ৩৬২ জন ও নারী ভোটার ৪ কোটি ৯৫ লাখ ৭৮ হাজার ১৯১ জন।

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে দেশের নারী সমাজের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের বিষয়টি রাষ্ট্রীয়ভাবে নিরুৎসাহিত অথবা অনেক ক্ষেত্রে প্রতিরোধ করা হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর ধারণা করা হয়েছিল এ অবস্থার আমূল পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। স্বাধীনতার প্রায় চারযুগ অতিক্রান্ত হতে চললেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রগতি তেমন আশাপ্রদ নয়। এদেশের জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতি, নির্বাচন এবং নারী প্রতিনিধিদের অবস্থান পর্যালোচনায় নারীর ক্ষমতায়নের প্রকৃত চিত্র ফুটে উঠে।

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করা হয়। জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে সংরক্ষণ পদ্ধতি থাকলেও তা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। নিম্নে জাতীয় সংসদ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং রাজনৈতিক দলসমূহে নারী প্রতিনিধিত্বের পর্যালোচনা করা হলো :

সংবিধান ও জাতীয় নির্বাচনে নারীর অবস্থান ঃ

সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বলা হয়েছে, সংবিধান (দশম সংশোধন) আইন, ১৯৯০ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে শুরু করিয়া দশ বৎসরকাল অতিবাহিত হইবার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভাঙ্গিয়া না যাওয়া পর্যন্ত ত্রিশটি আসন কেবল মহিলা সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাঁহারা আইনানুযায়ী পূর্বোক্ত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন ঃ তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার কোন কিছুই এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন কোন আসনে মহিলার নির্বাচন নিবৃত্ত করিবে না।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীরা ক্ষমতা কাঠামোর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পান। ১৯৭২ সালে প্রণীত ও গৃহীত সংবিধানে ৩০০টি সাধারণ আসনের পাশাপাশি মহিলাদের জন্য ১৫টি আসন ১০ বছরের জন্য সংরক্ষণের কথা বলা হয়। নীতিনির্ধারকরা হয়তো ভেবেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশে নারী - পুরুষের সমতা খুব সহসাই প্রতিষ্ঠিত হবে তখন আর সংরক্ষিত আসনের প্রয়োজন হবে না।

পরবর্তীতে দেখা যায় সংরক্ষিত আসন সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করে প্রথমে ৩০,পরে ৪৫ এবং বর্তমানে ৫০টি আসন করা হয়েছে। ২০১১ সালের সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা ৪৫ থেকে বাড়িয়ে ৫০ করা হয়। তবে ওই সময় নারী আসনের মেয়াদ বাড়ানো হয়নি। এখন সংরক্ষিত নারী সংসদ সদস্যদের মেয়াদ আছে ২০১৯ সালের ২৪ জানুয়ারী পর্যন্ত। সংরক্ষিত আসনে মহিলাদের নির্বাচনের জন্য সমগ্র বাংলাদেশকে মোট ৫০টি ভাগে বিভক্ত করা হয়। এক একটি ভাগ এক বা একাধিক জেলা নিয়ে গঠিত। প্রতিটি ভাগ থেকে একজন করে মহিলা সদস্য নির্বাচিত হবেন। নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদের ৫০টি সংরক্ষিত আসনে মহিলাদের নির্বাচিত করার জন্য তফসিল ঘোষণা করে থাকে। এরপর ৩০০ জন সংসদ সদস্য, মহিলা সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোট দেন। তবে একটি আসনের জন্য একাধিক প্রার্থী না থাকলে ভোট গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে না। সপ্তদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আবারও সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ বাড়ানো/বহাল রাখার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার যা পরবর্তী আর ২৫ বছর বহাল থাকবে।

জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্বঃ একটি পরিসংখ্যানগত পার্শ্বচিত্র ঃ

বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নামে এক কক্ষবিশিষ্ট সংসদীয় ব্যবস্থা প্রচলিত যেখানে ৩০০ আসনে সদস্যগণ সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। এখানে নারী পুরুষ উভয়ের সমান ভোটাধিকার এবং উভয়েরই ৩০০ আসনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ রয়েছে। তবে অতিরিক্ত ৫০টি সংসদীয় আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে (সংবিধানে ১৭তম সংশোধনী,এপ্রিল ২০১৮ অনুসারে)।

নির্বাচনে বিজয়ী রাজনৈতিক দলগুলোর আসনের অনুপাতের ভিত্তিতে এই আসনগুলো ভাগ করা হয়। তথ্য প্রমানে দেখা যায় যে, ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে না থাকলে ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে রয়েছে (ইসলাম, ২০০৩)। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ইতিহাস পর্যালোচনায় নারীদের নির্বাচনী ও প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক অংশগ্রহনের দূর্বল চিত্র দেখা যায়।

নির্বাচনী রাজনীতির মাধ্যমে সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্বঃ

জাতীয় সংসদের ৩০০টি সাধারণ আসন সংসদীয় নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক সরাসরি একক সদস্য নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা হয়। যদি আমরা (টেবিল -১) পরিসংখ্যান দেখি, প্রথম সংসদ নির্বাচনে দেখা যায় সাধারন আসনে কোন নারী নির্বাচিত হতে পারেননি। দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচনে (১৯৭৯) দুজন নির্বাচিত হন। সেসময় খুলনা -১৪ আসন থেকে সৈয়দা রাজিয়া ফয়েজ ও টাঙ্গাইল-১ আসন থেকে আশিফা আকবর নির্বাচিত হন। তৃতীয় সংসদে পাঁচজন (১৯৮৬), চতুর্থ সংসদে চারজন (১৯৮৮), পঞ্চম সংসদে ছয়জন (১৯৯১), ষষ্ঠ সংসদে তিনজন (১৯৯৬ ফেব্রুয়ারী), সপ্তম সংসদ নিবাচনে আটজন (১৯৯৬ জুন), অষ্টম সংসদে সাতজন (২০০১), নবম সংসদে ২১জন (২০০৮), এবং দশম সংসদ নির্বাচনে ২২জন (২০১৪) নারী এমপি হিসেবে নির্বাচিত হন।

নির্বাচনের সময়কাল	নারী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সংখ্যা	সর্বপরি নারী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের শতকরা হার	সাধারন আসনে নির্বাচিত নারীদের সংখ্যা	সাধারন আসনে নির্বাচিত নারীদের শতকরা হার
১৯৭৩-৭৫ (১ম)	২	০.১৯	০	০.০
১৯৭৯-৮২ (২য়)	১৭	০.৮০	২	০.৭
১৯৮৬-৮৭ (৩য়)	২১	১.৩৮	৩/৫*	১.০
১৯৮৮-৯০ (৪র্থ)	৭	০.৭২	৪	১.৩
১৯৯১-৯৫ (৫ম)	৪৭	১.৯৯	৫/৬*	১.৭
১৯৯৬-৯৬ (৬ষ্ঠ)	৭	০.৭০	৩	১.০
১৯৯৬-০১ (৭ম)	৫১	১.৯৮	৮	২.৭
২০০১-০৬ (৮ম)	৪৯	২.৫৩	৭	২.৩
২০০৯-১৪(৯ম)	৬৫	৪.১৫	২১	৭.০
২০১৪ - (১০ম)	৩০*	৫.৫৫	২২	৭.৩
সর্বমোট	২৯৬	১.৮৯	৭৫/৭৮	২.৫১

গত দশম সংসদে সর্বোচ সংখ্যক ২২ জন নারী সাধারন আসনে নির্বাচিত হয়েছেন। যদি পূর্ববর্তী সংসদ অপেক্ষা চলতি সংসদে সাধারন আসনে জয়ী নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, তথাপি এই সংখ্যা পুরুষ সদস্যদের তুলনায় খুবই কম। সরাসরি নির্বাচনে বিজয়ী নারীদের শতকরা হার নিছক ৭.৩%।

জাতীয় সংসদের সাধারন আসনে নারীর প্রতিনিধিত্বঃ প্রবনতা ও বিশ্লেষণ

গবেষণায় এ অংশে জাতীয় সংসদের বিগত দশটি নির্বাচনে সাধারন আসনে নারী প্রতিনিধিদের বিষয়ে লক্ষণীয় প্রবণতা, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী নারী সদস্যদের সংখ্যা এবং নির্বাচিত নারী সংসদ সদস্যদের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। এছাড়া ও রাজনৈতিক দলগুলোর পুরুষ ও নারী প্রার্থীদের মনোনয়নের তুলনামূলক চিত্র এবং সংসদে নারী এবং পুরুষ প্রতিনিধিত্বের তথ্যচিত্র আলোচিত হয়েছে। প্রার্থী নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর জেন্ডার বিবেচনা ও তাদের সক্রিয়তা এই অংশে বিশ্লেষন করা হয়েছে।

নির্বাচনের সময়কাল	নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলের সংখ্যা	মোট প্রার্থীর সংখ্যা	পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা	মনোনয়ন প্রাপ্ত পুরুষ প্রার্থীদের শতকরা হার	নারী প্রার্থীর সংখ্যা	মনোনয়ন প্রাপ্ত নারী প্রার্থীদের শতকরা হার
১৯৭৩-৭৫ (১ম)	১৪	১০৭৮	১০৭৬	৯৯.৮১	২	০.১৯
১৯৭৯-৮২ (২য়)	২৯	২১২৭	২১১০	৯৯.২০	১৭	০.৮০
১৯৮৬-৮৭ (৩য়)	২৮	১৫২৭	১৫০৬	৯৮.৬২	২১	১.৩৮
১৯৮৮-৯০ (৪র্থ)	৮	৯৭৮	৯৭১	৯৯.২৮	৭	০.৭২
১৯৯১-৯৫ (৫ম)	৭৫	২৩৬৩	২৩১৬	৯৮.০১	৪৭	১.৯৯
১৯৯৬-৯৬ (৬ষ্ঠ)	৪১	৯৯৩	৯৮৬	৯৯.৩০	৭	০.৭০
১৯৯৬-০১ (৭ম)	৮১	২৫৭৪	২৫২৩	৯৮.০২	৫১	১.৯৮
২০০১-০৬ (৮ম)	৫৪	১৯৩৯	১৮৯০	৯৭.৪৭	৪৯	২.৫৩
২০০৯-১৪(৯ম)	৩৮	১৫৬৭	১৫০২	৯৫.৮৫	৬৫	৪.১৫
২০১৪ - (১০ম)	১২	৫৪১	৫১১	৯৪.৪৫	৩১*	৫.৫৫
সর্বমোট		১৫,৬৮৭	১৫,৩৯১	৯৮.১১	২৯৬	১.৮৯

টেবিল-৭ হইতে দেখা যায়, বিগত দশটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ১৫,৬৮৭ জন প্রার্থীকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে তন্মধ্যে ১৫,৩৯১ জন পুরুষ ও ২৯৬ জন নারীদেরকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে । মাত্র ১.৮৯% মনোনয়ন নারীদেরকে দেয়া হয়েছে। যদি আমরা প্রথম ও দশম সংসদের মধ্যে তুলনা করি তাহলে দেখতে পাই

এই দীর্ঘ ৪৭ বছরে নারীদের মনোনয়ন প্রাপ্তির হার বেড়েছে ৫%। দশটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিভিন্ন পর্যালোচনায় দেখা যায় কিছু আসনে প্রার্থী/নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মৃত্যুতে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে সেই সংখ্যা পর্যালোচনায়ও নারীদের মনোনয়নের ক্ষেত্রে তেমন অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি।

নির্বাচনের সময়কাল	সাধারণ আসন সংখ্যা	পুরুষ প্রার্থীদের জয়ের সংখ্যা	পুরুষ প্রার্থীদের জয়ের অনুপাত (%)	নারী প্রার্থীদের জয়ের সংখ্যা	নারী প্রার্থীদের জয়ের অনুপাত (%)
১৯৭৩-৭৫ (১ম)	৩০০	৩০০	১০০.০	০	০.০
১৯৭৯-৮২ (২য়)	৩০০	২৯৮	৯৯.৩	২	০.৭
১৯৮৬-৮৭ (৩য়)	৩০০	২৯৭	৯৯.০	৩/৫*	১.০
১৯৮৮-৯০ (৪র্থ)	৩০০	২৯৬	৯৮.৭	৪	১.৩
১৯৯১-৯৫ (৫ম)	৩০০	২৯৫	৯৮.৩	৫/৬*	১.৭
১৯৯৬-৯৬ (৬ষ্ঠ)	২৮৯	২৮৬	৯৯.০	৩	১.০
১৯৯৬-০১ (৭ম)	৩০০	২৯২	৯৭.৩	৮	২.৭
২০০১-০৬ (৮ম)	৩০০	২৯৩	৯৭.৭	৭	২.৩
২০০৯-১৪(৯ম)	৩০০	২৭৯	৯৩.০	২১	৭.০
২০১৪ - (১০ম)	৩০০	২৭৮	৯২.৭	২২	৭.৩
সর্বমোট	২৯৮৯	২৯১৪	৯৭.৪৯	৭৫/৭৮	২.৫১

টেবিল-৮ এ দেখা যায়, দশটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ২৯৮৯ সাধারন আসনের মধ্যে ২৯১৮টি আসনে পুরুষ সদস্য ও মাত্র ৭৫/৭৮ আসনে নারী সদস্য জয় লাভে সমর্থ হয়েছেন যা শতকরা ২.৫১%। একই ধারা বজায় থাকলে আগামী একাদশ জাতীয় নির্বাচনে এই সদস্য হবে ২৭ (অনুমানিক)।
৯% নারীদের মনোনয়ন প্রদান এবং ২.৫১% নারীর সংসদের সাধারন আসনে প্রতিনিধিত্ব জাতীয় রাজনীতিতে নারীর দূর্বল অংশগ্রহন ও লিঙ্গ বৈষম্যের চিত্রই তুলে ধরে।

মোট মনোনয়ন প্রাপ্ত নারীদের সংখ্যা (১৯৭৩-২০১০)	মনোনয়ন প্রাপ্ত নারীদের প্রকৃত সংখ্যা (একাধিকবার মনোনয়ন প্রাপ্ত নারী প্রার্থী ব্যাতীত) (১৯৭৩-২০১০)	সাধারণ আসনে জয়ী নারীদের সংখ্যা (১৯৭৩-২০১০)	মনোনয়ন প্রাপ্ত নারীদের মধ্যে সাধারণ আসনে বিজয়ীদের শতকরা হার (১৯৭৩-২০১০)
২৯৬	২০৬	৭৫/৭৮	৩৬.৪০/৩৭.৮৬

টেবিল-৯ অনুসারে দেখা যায় বিগত দশটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ২৯৬ জন নারী মনোনয়ন লাভ করেছিলেন কিন্তু একাধিক আসনে একই নারী সদস্য মনোনয়ন পাওয়ায় বা একই নারী একাধিক সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ায় এর প্রকৃত সংখ্যা এর চেয়েও কম মাত্র ২০৬ জন । সব কয়টি নির্বাচন মিলে মাত্র ৭৫/৭৮ জন নারী সংসদে সাধারন আসন হইতে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এতে করে দেখা যায়, যতজন মনোনয়ন লাভ করেছেন তার মাত্র চার ভাগের একভাগ সংসদে সাধারণ আসনে নির্বাচত সদস্য হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনে নারীর প্রতিনিধিত্বঃ প্রবনতা ও বিশ্লেষণ

সংরক্ষিত মহিলা আসনের বিধানটি নির্দিষ্ট ১০ বছর মেয়াদের জন্য প্রাথমিকভাবে সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল ১৯৭২ সালে। বিধানটি অনেক সাংবিধানিক সংশোধনী দ্বারা সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ছিল ১৫ তবে পরবর্তীতে এটি বেড়ে ৩০ তারপর ৪৫ এবং অবশেষে ৫০। নারী অধিকারের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলির ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়েছিল প্রথম থেকেই। সময় ও অভিজ্ঞতার

মাপকাঠিতে দেখা যায় যে এই সমালোচনার উৎকর্ষতা রয়েছে। যদিও একে "ক্ষমতার ভারসাম্য" বা "ভোটাধিকার" হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সমালোচকদের মতে সংসদে নারীদের জন্য ৫০টি সংরক্ষিত আসনের বিধান মূল সংবিধানের আদর্শ ও ভাব ধারার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ বিশেষত অনুচ্ছেদ ১০, ১১, ১৯ (১), ২৭, ২৮ (১), ২৮ (২) এবং ৬৫ (২) এর।

সংরক্ষিত আসনের নির্বাচন পদ্ধতি

বাংলাদেশের সংবিধানের অধীনে (ধারা ৬৫ (৩) সংরক্ষিত আসনের নারীরা এক হস্তান্তর যোগ্য ভোটের মাধ্যমে সংসদে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের আইন অনুযায়ী সংসদ সদস্যদের (এমপি) দ্বারা নির্বাচিত হবেন। সংসদে সংরক্ষিত আসনগুলি মোট আসনের অনুপাতে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলোকে বরাদ্দ করা হয়। এই অনুচ্ছেদটি কার্যকর করতে ২৯শে নভেম্বর ২০০৪ তারিখে সংসদের ৩০০ জন সরাসরি নির্বাচিত এমপিদের দ্বারা পরোক্ষ নির্বাচনের জন্য জাতীয় সংসদ নারী অধিকার সংরক্ষিত নির্বাচন আইন প্রণয়ন করা হয়।

নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সংক্ষিত সাংবিধানিক ইতিহাস

বাংলঅদেশের ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে নারীদের জন্য ১৫টি সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা রাখা হয় এবং এই বিধানটি ১০ বছরের জন্য কার্যকর রাখা হয়। ১৯৭৯ সালে ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে জিয়াউর রহমান সরকার সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ১৫ থেকে ৩ শে উন্নীত করে এবং এর মেয়াদও ১০ বছর থেকে ১৫ বছরে উন্নীত করা হয়। ১৯৮৭ সালের ১০ ডিসেম্বর ১৫ বছরের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। সুতরাং চতুর্থ সংসদে প্রথমে কোন সংরক্ষিত আসন ছিল না। এরশাদ সরকারের সময় নির্বাচনী তফসিলি দলগুলোর মধ্যে এই আলোচনা ও বিতর্ক চলেছে যে, এই ধরনের সংরক্ষিত আসনের প্রয়োজনীয়তা বা আবশ্যকতা রয়েছে কিনা। তবে সেই সময় অবশেষে ১০ বছরের আরেকটি মেয়াদে সংরক্ষিত আসন রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। শেষ পর্যন্ত সংবিধান (দশম সংশোধনী) বিলটি ১০ই জুন ১৯৯০ সংসদে উত্থাপন করা হয় এবং এই সাথে ১২ জুন তা সংসদে পাস হয়। এই সংশোধনীর মাধ্যমে নারীদের জন্য ৩০টি সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ আরো ১০ বছরের জন্য বাড়ানো হয়। অনুচ্ছেদ ৬ তে ধারা (৩) পুনঃঅন্তর্ভূক্ত করা হয়। যা পরবর্তী সংসদ অধিবেশনের শুরুতে কার্যকর করা হয়।

সপ্তম সংসদের সময়কাল শেষ হওয়ার সাথে সাথে ১০ বছরের মেয়াদ ও শেষ হওয়ার সাথে সাথে ১০ বছরের মেয়াদ ও শেষ হয় এবং এজন্য অস্টম সংসদের শুরুতে প্রাথমিকভাবে নারীদের জন্য কোন সংরক্ষিত আসন ছিল না। ১৬ই মে ২০০৪ তারিখে অস্টম সংসদ সংবিধানের (চতুদর্শ সংশোধনী) আইন পাস করে, এখানে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ৪৫ এবং মেয়াদ ১০ বছরে করা হয়।

সংবিধানের (পঞ্চদশ সংশোধনী) আইন ২০১১ দ্বারা পরবর্তীতে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ৪৫ থেকে ৫০ উন্নীত করা হয়েছিল।

অবশেষে সংবিধানের (১৭তম সংশোধনী) দ্বারা সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ পরবর্তী ২৫ বছরের জন্য অনুমোদিত হয়। সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ সংক্রান্ত বিলটি ৮ই জুলাই ২০১৮ তারিখ জাতীয় সংসদে পাশ হয়।

সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যদের অবস্থান এবং অবস্থা ঃ

যদিও সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের ৫০ জন সদস্য সরাসরি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন না তবুও তারা আইনগতভাবে ৩০০ আসনে নির্বাচিত সাধারণ সদস্যগণের ন্যায় সমান পদমর্যাদায় অবস্থান করেন। সেখানে তারা একই সুযোগ সুবিধা উপভোগ করেন এবং পার্লামেন্টের সকল কার্যক্রমে সাধারণ সদস্যদের ন্যায় সমঅধিকার ভোগ করেন। এমনকি সংসদের সংরক্ষিত নারী আসন থেকে স্পিকারও নির্বাচিত হয়েছেন। যা বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী ইতিহাসে একটি অসাধারণ ঘটনা। তবে প্রতিনিধিত্বের দৃষ্টিকোন থেকে তারা সরাসরি সংসদ সদস্যদের তুলনায় দুর্বল অবস্থানে রয়েছে। কারণ এই ৫০ জন নারী সংসদ সদস্য জনসংখ্যার কোন অংশেরই প্রতিনিধিত্বকরেন না শুধুমাত্র সংসদে দলের অনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব করেন। যদিও তাদের

ভৌগলিকভাবে সংসদীয় আসন নেই, তাই তাদের এর সাথে সংশ্লিষ্টতাও কম । কারণ ঐ অঞ্চলের জনগণ তাদের নির্বাচিত করে না এবংসেই জন্য তাদের প্রতিনিধিত্বকারী নির্বাচনী এলাকা মূলত কাল্পনিক। সাধারণত নারীদের পক্ষে প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবেও তাদের বলা যাবে না। কারণ তাদের নির্বাচনে অত্র এলাকার নারীদের কোন ভূমিকা নেই। উপরন্তু, যেহেতু সংরক্ষিত আসনের নারী সংসদ সদস্যরা একটি প্রতিযোগিতামূলত নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নির্বাচিত হন না, তাই তারা তাদের সরাসরি নির্বাচিত সহকর্মীদের দ্বারা যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হন না, তারা প্রকৃতপক্ষে তাদের একটি "ভোট ব্যাংক" বিবেচনা করে।

নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের কারণ ও যুক্তি

আমাদের সংবিধান স্বীকার করে যে আইন (২৭ অনুচ্ছেদ) অনুযায়ী সকল নাগরিক এবং তাদের সমান সুযোগ প্রদান করে (ধারা ২৯)। যাই হোক বাস্তবে এর প্রয়োগ খুব একটা দেখা যায় না। সকল লিঙ্গ, শ্রেণী ও পেশার মানুষ সমান সুযোগ সুবিধা পায় না। যদিও দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী তথাপি সমাজের প্রতিটিক্ষেত্রে তাদের অসমপ্রতিনিধিত্ব লক্ষ্য করা যায়। অতএব, সমাজের কোন অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য বিশেষ বিধানের বিষয়টি সর্বজন স্বীকৃত। সংসদ- আইন সভা- রাষ্ট্রের তিনটি মূল অঙ্গের মধ্যে একটি। দূর্ভাগ্যবশতঃ নারীদের সেখানে অসমপ্রতিনিধিত্ব রয়েছে। তাদের সমকক্ষ পুরুষ সদস্যদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য আমাদের দেশের নারীরা কিছুটা অসুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে, কারণ তাদের অবস্থানকে অসম মনে করা হয় এবং সমাজে পুরুষদের তুলনায় অধস্তন বিবেচনা করা হয়। একা কাজগুলো বিবেচনা সাপেক্ষে সংবিধানে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের বিধান অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় সংসদে নারীদের নূন্যতম প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা এবং জাতীয় রাজনীতিতে তাদের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। এর কারণ যতই মহৎ হোক না কেন বা দর্শন যাই হোকনা কেন যারা সংবিধান প্রনয়ন করেছেন তারা হয়ত তাদের নির্বাচন প্রক্রিয়া গণতান্ত্রিক, কার্যকর এবং অর্থবহ করারমত সতর্ক মনোযোগ প্রদান করেননি। যদিও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ১০ বছরের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তা অনুমোদন করা হয়েছিল এবং পরবর্তী সরকারগুলো কর্তৃক তা সাংবিধানিক সংশোধনীয়র মাধ্যমে বর্ধিত করা হয়েংছিল। তবে সংরক্ষিত আসন পূরণ করার জন্য নারীদের নির্বাচনের পদ্ধতি একই রকম রয়ে গেছে যা সমগ্র প্রচেষ্টা ও উদ্দেশ্যকে অর্থহীন করেছে।

কীভাবে সংরক্ষিত নারী সদস্যদের "ভোট ব্যাংক" বা দলীয় প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয় ঃ

আগেই যেমন উল্লেখ করা হয়েছে সংরক্ষিত নারী সংসদ সদস্যগণ সংসদের প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলোর সমানুপাতিক সরাসরি নির্বাচিত না হওয়ার কারণে এই ৫০ জন নারী সংসদ সদস্য প্রকৃত প্রতিনিধিত্বের পরিবর্তে দলের 'নিয়ামক' বা ভোট ব্যাংক হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। একটি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক সংসদের কখনই এত বৃহৎ সংখ্যক সংসদ সদস্য পরোক্ষ প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত হতে পারে না। আমরা আলোচনার পরবর্তী অংশে দেখতে পাই যে, নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের বিধানগুলো "ভোট ব্যাংক" হিসেবে অবব্যবহৃত হচ্ছে, যা ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার্থে ব্যবহৃত হয়।

প্রথমতঃ একটি সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যা গরিষ্টতা অর্জনকারী একটি দল সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যকসদস্য না থাকলে সংরক্ষিত আসনগুলিতে একটি সম্পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। সেলক্ষ্যে অগ্রসর হওয়ার পথে এটাকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের উপায় মনে করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ এই ৫০ জন সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্য সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে ভোট প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তৃতীয়তঃ সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যগণ বিশেষত ক্ষমতাশীল দলের সদস্যগণ সংসদে আইন প্রনয়নের ক্ষেত্রে দলের অধীনস্ত বাধ্যগত হিসাবে বিবেচিত হন। আইন তৈরির সময়, অধ্যাদেশ জারি, সংবিধান সংশোধন

অথবা অনাস্থা ভোটের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের ব্যবহার করে থাকে। তারা দলীয় অনুগত্যের বাইরে কোন আলোচনায় যায় না বা সংসদে বিল আনে না।

উপসংহারঃ

সংরক্ষিত নারী আসন একটি ইতিবাচর উদ্যোগ এবং ক্রান্তিকালীন বিধান এটি অস্থায়ী বা স্বল্প মেয়াদের জন্য হতে পারে কিন্তু এটি দীর্ঘমেয়াদী বা স্থায়ী কোন সমাধান হতে পারে না। সংরক্ষিত নারী আসনের বিধান প্রণয়নকালীন পরিবেশ পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। সাধারণ অর্থে সমাজে নারীদের অনেক অগ্রগতি সাধিত হযেছে। বর্তমান সংসদের প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেতা এবং স্পিকার সকলেই নারী কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় ও নারী নেতৃত্বাধীন রয়েছে। এই অবস্থা বা এমনকি আরো কিছু ক্ষেত্রে (স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র মন্ত্রীও বিগত মেয়াদে ছিলেন নারী)। গত সংসদের একই রকম ছিলো। দেশের দুইটি বৃহত্তম রাজনৈতিক দল, যারা গত ২৫ বছরে দেশ শাসন করেছে, তাদের নেতৃত্বে রয়েছেন দুইজন নারী। দলে তাদের একছত্র আধিপত্য, রয়েছে জনসমর্থন এবং নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। অতএব দৃঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করার সময় এসেছেঃ এদেশের সংসদের নারী আসনের বিধান রাখার প্রয়োজন রয়েছে কিনা! দেশের বড় দুটি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন এমন দুই জন নারী কেন নারী উন্নয়নে দরের অব্যন্তরে কোন ইতিবাচক পদক্ষেপ নিচ্ছেন না যাতে করে তারা সরাসরি নির্বাচিত হয়ে আসতে পারে। যেমনটা একটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ঘটে? এমনকি যদি সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন বিধান রাখা হয় তবে নির্বাচনের বর্তমন পদ্ধতি পরিবর্তন করা উচিত। প্রক্রিয়াটি গণতান্ত্রিক, প্রকৃতপ্রতিনিধিত্বপূর্ণ এবং অর্থপূর্ণ হতেই হবে। এটি "নির্বাচিত নারীদেরকে দেওয়া উপহারের ন্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্তৃক মনোনীত হওয়া উচিত নয়, যাদের সরাসরি নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে না।"

যে বিকল্প পদ্ধতিগুলো চিন্তু করা যেতে পারে

ক) সাধারণ আসনের মতো বিশেষভাবে মনোনীত নিবাচনী এলাকার সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;

খ) রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাপ্ত মোট ভোটের বিত্তিতে সংরক্ষিত আসনগুলোর জন্য সত্যিকারের প্রতিনিধিত্বমূলক সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচন পদ্ধতির প্রবর্তন করা যেতে পারে। পশ্চিমাদেশগুলোতে এই পদ্ধতি ব্যাপকভাবে অনুসরণ করা হয়। যুক্তরাজ্যে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা ব্যবহার করে, ইউরোপীয় পার্লামেন্ট সদস্য (এমইপি) নির্বাচনের ক্ষেত্রে;

গ) স্থানীয় সরকার নির্বাচনের ন্যায় জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও নারী দের জন্য সুনির্দিষ্ট সংরক্ষিত াসনে ব্যবস্থা রাখা এবং সাধারণ আসনের ন্যায় নির্বাচনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

এ ছাড়াও অন্যকোন বিকল্প পদ্ধতি যদি পাওয়া যায় তা সঠিকভাবে অনুসন্ধান করা উচিত।

সংবিধান ও তৃণমূল রাজনীতিতে নারীর অবস্থান ঃ

সাংবিধানিকভাবে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের সকল কর্মকান্ডে নারীর সম-অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সংবিধানে বিধান রাখা হয়েছে। সংবিধানের মাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি মৌলিক অধিকারসমূহ যেন নিশ্চিত করা হয়, তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। অর্থ-শিক্ষাসহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির দিক থেকে বাংলাদেশের নারী সমাজ দু'টি ভিন্ন অবস্থানে অবস্থান করছে। এর একটি অংশ শহরভিত্তিক অপরটি গ্রামভিত্তিক। নারী সমাজের বড় অংশটিই গ্রামে বাস করে। শহরে বসবাসরত মহিলাদের শিক্ষা ও অর্থ উপার্জনের সুযোগ এবং সামাজিক জটিলতা কম থাকায় তাঁরা গ্রামে বসবাসরত মহিলাদের তুলনায় কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা এগিয়ে গেছেন। সূদুরপ্রসারী পরিকল্পনা ও দৃঢ় রাজনৈতিক প্রতিশ্র"তির অভাব এ সমস্যাকে আরো প্রকট করে তুলেছে। ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানের দুইটি অনুচ্ছেদের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সংবিধান প্রণেতাগণ নারী সমাজের অবস্থান বিবেচনা করে তাঁদের দায়িত্ব অনেকাংশেই পালন করেছেন।

সংবিধানে ৯ অনুচ্ছেদে স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ড় প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন সম্পর্কে বলা হয়েছে, রাষ্ট্র সংশি- ষ্ট এলাকার প্রতিনিধিগণ সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ড় প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ দান করিবেন এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহে কৃষক, শ্রমিক এবং মহিলাদিগকে যথাসম্ভব বিশেষ প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হইবে।

অনুচ্ছেদ ১০ এ জাতীয় জীবনে মহিলাদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

৫৯ নং অনুচ্ছেদে স্থানীয় শাসন সম্পর্কে বলা হয়েছে –

১) আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রে প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।

২) এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন-সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নিদিশ করিবেন, এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উলি- খিত অনুরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান যথোপযুক্ত প্রশাসনিক এককাংশের মধ্যে সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন এবং অনুরূপ আইনে নিম্বলিখিত বিষয়-সংক্রান্ত্র দায়িত্ব অন্ড়র্ভুক্ত হইতে পারিবে ঃ

(ক) প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীদের কার্য

(খ) জনশৃঙ্খলা-রক্ষা

(গ) জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন।

৬০ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীকে পূর্ণ কার্যকরতাদানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উলি- খিত স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ড় প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিবেন।

সংবিধানের এ ধারাগুলোয় দেখা যাচ্ছে স্থানীয় সরকার কাঠামোতে মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগের কথা বলা হয়েছে। আর সেক্ষেত্রে তৃণমূল পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য সংবিধানে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার যে বিধান রাখা হয়েছে তা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করা যায় তবে জাতির উন্নয়নের অগ্রযাত্রা নিশ্চিত হবে।

স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ/প্রতিনিধিত্ব ঃ

সংসদ নির্বাচনের মতো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীর অংশগ্রহণ/ প্রতিনিধিত্বের ইতিহাস দীর্ঘ দিনের। বিশেষ করে স্থানীয় সরকারের সবচেয়ে শক্তিশালী ও পুরানো প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদে নারীর প্রতিনিধিত্ব ১৯৭৬ সাল থেকে। যদিও ১৯৯৭ সালের পূর্বে মনোনয়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইউপিতে নারী প্রতিনিধিগণ নির্বাচিত হতেন। ১৯৯৭ সাল থেকে স্থানীয় সরকারের সকল স্তরে সংরক্ষিত আসনের মাধমে নারীদের জন্য কোটা ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়। কিন্তু সাধারন আসন নারীদের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়। নিম্নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে নির্বাচনে নারীদের সংখ্যাগত তথ্য উপস্থাপন করা হলো-

ইউনিয়ন পরিষদ :

১৯৯৭ সাল থেকে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদের তিনটি নির্বাচনে নারী প্রার্থীদের চেয়ারম্যান, সাধারন ও সংরক্ষিত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বীতার সংখ্যাগত তথ্য বিশ্লেষণ করা হলো।

নির্বাচনের সাল	ইউপি সংখ্যা	চেয়ারম্যান	সাধারণ আসন	সংরক্ষিত আসন সংখ্যা	মোট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা	আসন প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা
১৯৯৭	৪৩৫১	২৩	-	-	১০২	-
১৯৯৭	৪৩৫১	-	১১০	-	৪৫৬	-
১৯৯৭	৪৩৫১	-	-	১৩০৫৩	৫১,৬৮৯	প্রায় ৪ জন
২০০৩	৪২৩৪	২২	-	-	২৩২	-
২০০৩	৪২৩৪	-	৭৯	-	৬১৭	-
২০০৩	৪২৩৪			১২৬৮৪	৩৯,৪১৯	৩.১০ জন
২০১১	৪১৪৯	২৩	-	-	২২৬	
২০১১	৪১৪৯					
২০১১	৪১৪৯			১২৪৪৭	৩৭,২১৭	২.৯ জন
২০১৬	৪২৭৯	২৯				
২০১৬	৪২৭৯	-	৪৫	-	-	
২০১৬	৪২৭৯	-	-	১২,৮৩৭	-	

সূত্রসমূহ: নির্বাচন কমিশন ওয়েবসাইট, ফেয়ার ইলেকশন মনিটরিং এ্যালায়েন্স (ফেমা), অপরাজিতা বেইজলাইন রিপোর্ট

উপরের তথ্য অনুযায়ী দেখা গেছে, ১৯৯৭ সালে একত্রে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ৪৩৫১ টি ইউপিতে ১৩০৫৩ টি সংরক্ষিত আসনের বিপরীতে ৫১৬৮৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন। গড়ে প্রতিটি আসনের জন্য প্রায় ৪ জন প্রার্থী সেবার প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেছিলেন। পরবর্তীতে ২০০৩ সালে আসন প্রতি প্রার্থীর সংখ্যা কমে দাড়ায় ৩.১০ জন, ২০১১ সালে একত্রে অনুষ্ঠিত ইউপি নির্বাচনে সংরক্ষিত আসন প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর গড় সংখ্যা নেমে দাঁড়ায় ২.৯ জনে এবং সর্বশেষ ২০১৬ সালের নির্বাচনে।

উপজেলা পরিষদ :

২০০৯ ও ২০১৪ সাল অনুষ্ঠিত উপজেলা পরিষদের দুইটি নির্বাচনে নারী প্রার্থীদের সংরক্ষিত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বীতার সংখ্যাগত তথ্য বিশ্লেষণ করা হলো।

নির্বাচনের সাল	উপজেলার সংখ্যা	সংরক্ষিত আসন সংখ্যা	মোট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা	আসন প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা
২০০৯	৪৬৩	৪৬৩	২,৯০০	৮-৯ জন
২০১৪	৪৫৮	৪৫৮	১,৫০৭	৩-৪ জন

উপরের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে (২০০৯) প্রতিটি উপজেলায় নারী প্রার্থীর সংখ্যা ছিল উল্লেখ করার মত। গড়ে প্রতিটি আসনের জন্য প্রায় ৮-৯ জন প্রার্থী সেবার প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেছিলেন। পরবর্তীতে ২০১১ সালে আসন প্রতি প্রার্থীর সংখ্যা কমে দাড়ায় ৩-৪ জন। পাঁচ বছরের ব্যবধানে চতুর্থ উপজেলা নির্বাচনে (২০১৪) নারীর অংশগ্রহণ ৪৮ শতাংশ কমেছে। যা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না।

চেয়ারম্যান ও সাধারণ আসনে নারীদের অংশগ্রহণ এবং নির্বাচিত হওয়ার সংখ্যা উল্লেখ করার মত নয়।

উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত আসনে নির্বাচনের তথ্য চিত্র (যারা ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন)

উপজেলা পরিষদের মেয়াদকাল পাঁচ বছর হলেও এ পরিষদের সংরক্ষিত আসনের নির্বাচিত নারী সদস্যগণ এক বছরও দায়িত্ব পালনের সুযোগ পাচ্ছে না। ২০১৫ সালের জুনে এসব পদে যারা নির্বাচিত হয়েছিলেন কিছু আসন বাদে তাদের পদ ২০১৬ সালের প্রথম থেকে মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই শূন্য হয়ে যায়। নির্বাচন কমিশন এ ধরনের একহাজার চারশত একানব্বইটি শূন্য পদের নির্বাচন সম্পন্ন করে ২৯ জানুয়ারী ২০১৮ সালে। এর আগে স্থানীয় সরকার বিভাগ গত ১৭ ডিসেম্বর ২০১৭ এসকল পদ শূন্য ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি করে এবং ৮ জানুয়ারী নির্বাচন কমিশন এ সকল আসনে ২৯ জানুয়ারী ২০১৮ তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাচন কমিশনারদের নির্দেশ পাঠায়। এ নির্বাচনে যারা বিজয়ী হয়েছে তাদের মেয়াদকালও সর্বোচ্চ এক থেকে দেড় বছর হতে পারে। কেননা ২০১৯ সালে জানুয়ারীতে পরবর্তী উপজেলা পরিষদ নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমান যে উপজেলা পরিষদ রয়েছে তার মেয়াদকাল হলো ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত। (নির্বাচন জানুয়ারীর পর হওয়ার সম্ভাবনা বেশী কারণ তখন জাতীয় নির্বাচনের সময় হতে পারে)।

২৯ জানুয়ারী ২০১৮ সালের এ নির্বাচনে দেখা যায় ৮৭৩টি আসনে ভোট গ্রহণের প্রয়োজন হয়নি। কেনান এসব আসনে একজন করে প্রার্থী মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছে এবং তারা বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। একক প্রার্থী থাকার বিষয়ে স্থানীয় পর্যায়ের ইউপি এবং পৌরসভার নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিগণ বলেন তাদের জন্য নিদির্ষ্ট কোন দায়িত্ব না থাকায় এবারের নির্বাচনে কোন আগ্রহ ছিল না পাশাপাশি রাজনৈতিক কারণে একজনের বেশী প্রার্থী হতে দেয়া হয়নি। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এবারের নির্বাচনে ২১৫টি আসনে কোন প্রার্থীই ছিল না/ প্রার্থী খুজে পায়নি নির্বাচন কমিশন।

ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার নির্বাচনের সঙ্গে উপজেলা পরিষদের নির্বাচনের সময় ব্যবধানের কারণেই এ সংকট সৃষ্টি হয়েছে এবং যে উদ্দেশ্যে উপজেলা পরিষদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

প্রসঙ্গত, দীর্ঘ ১৯ বছর পর ২০০৯ সালের ২২ জানুয়ারী উপজেলা পরিষদের তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর সে সময় ড. এটিএম সামসুল হুদার নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া ইউপি ও পৌরসভাগুলোর সম্পন্ন হওয়ার আগে উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত নারী আসনগুলোতে নির্বাচন করা সঠিক হবেনা। কারণ ইউপি ও পৌরসভার সংরক্ষিত নারী আসনগুলোর সদস্য ও কাউন্সিলরদের মধ্যেই এই নির্বাচন করতে হবে। কিন্তু ২০১১ সালে ইউপি ও পৌরসভার নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর বিভিন্ন কারণে সংরক্ষিত ঐসব আসনে নির্বাচন করার কোন উদ্যোগ নিতে পারেনি নির্বাচন কমিশন। এই অবস্থায় সংরক্ষিত নারী সদস্য ছাড়াই পার হয় তৃতীয় মেয়াদের উপজেলা পরিষদ নির্বাচন। এরপর উপজেলা পরিষদসমূহে চতুর্থ মেয়াদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে মার্চ পর্যন্ত। কিন্তু এ নির্বাচনের পর কাজী রকিবউদ্দীন আহমদের কমিশন যথাসময়ে সংরক্ষিত আসনের নির্বাচন করা থেকে বিরত থাকে। তখন নির্বাচন কমিশন থেকে বলা হয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে কোন প্রকার নির্বাচন করা যাবে না। এর পর ২০১৫ সালের ১৫ জুন প্রথমবারের মত উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

এবার উপজেলা পরিষদের ১ হাজার ৪৯১টি সংরক্ষিত আসনের পদ শূণ্য হওয়ার কারণ সম্পর্কে জানা যায় ২০১৬ সালের মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ এবং তার আগে ২০১৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত পৌরসভা নির্বাচনে সংরক্ষিত নারী সদস্যরা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভায় তাদের পদ হারিয়েছে। একই সঙ্গে উপজেলা পরিষদেও তাদের পদ শূন্য হয়ে যায়।

জেলা পরিষদ

জেলা পরিষদ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ব্রিটিশ আমল থেকেই জেলা বোর্ড নামে এ প্রতিষ্ঠানটি চালু ছিল। পাকিস্তান আমলে এর নামকরণ করা হয় জেলা কাউন্সিল।স্বাধীনতার পর এটি আবার জেলা জেলা বোর্ড নামে অভিহিত হয়। ১৯৭৫ সালে জেলা বোর্ডকে শক্তিশালী করার জন্য জেলা গভর্ণর পদ্ধতি চালু করা হলেও তা কার্যকর করার সুযোগ হয়নি। ১৯৭৬ সালে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ জারি করার মাধ্যমে এর নামকরণ করা হয় জেলা পরিষদ। সে সময় জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে সরকার মনোনীত ব্যক্তিদের নিয়োগ দেয়া হতো। ১৯৮৮ সালে স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন, ১৯৮৮ পাস হয়। এই আইনেও পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্য নির্বাচনের বিধান রাখা হয়। ১৯৯১ সালে সরকার এই আইনটি বাতিল এবং সরকারের উপসচিব পদমর্যাদার একজনকে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা দিয়ে জেলা পরিষদ পরিচালনা করে। পরবর্তীতে সরকার জেলা পরিষদ আইন,২০০০ পাস করে। ২০১১ সালের ডিসেম্বরে সরকার জেলা পরিষদ আইন,২০০০ এর ৮২(১) ধারা অনুযায়ী পার্বত্য জেলা ব্যতিত ৬১ টি জেলা পরিষদে প্রশাসক নিয়োগ করে। পাঁচ বছর জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে জেলা পরিষদের কার্যাবলী সম্পাদন করে। 'জেলা পরিষদ (সংশোধন)' বিল ২০১৬ অনুযায়ী স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ভোটে ৫৯টি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, সাধারন ও সংরক্ষিত আসনের সদস্য নির্বাচিত হন ২৮ ডিসেম্বর ২০১৬ সালে।

নিম্নে জেলা পরিষদ নির্বাচনে নারী প্রার্থীদের চেয়ারম্যান, সাধারনও সংরক্ষিত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা ও জয়ী হওয়ার সংখ্যাগত তথ্য বিশ্লেষণ করা হলো

নির্বাচনের সাল	জেলা	নির্বাচন অনুষ্ঠানের সংখ্যা	চেয়ারম্যান	সাধারণ আসন	সংরক্ষিত আসন সংখ্যা	মোট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা	আসন প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা
২০১৬	৬৪	৬১	১				
২০১৬	৬৪	৬১	-	২	-	১৪	
২০১৬	৬৪	৬১	-		৩০৫	৮০৬	

রাজনৈতিক দলসমূহে নারীর প্রতিনিধিত্ব

রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন স্তরের কমিটিতে নারীর অন্তর্ভুক্ত হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়ার সুযোগ তৈরি হয়। উল্লেখ্য যে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন করার জন্য রাজনৈতিক দলের সকল স্তরের (কেন্দ্রীয়, জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন) কমিটিতে ২০২০ সালের মধ্যে ৩৩% (এক-তৃতীয়াংশ) নারীর প্রতিনিধিত্ব বাধ্যতামূলক করার বিধান ২০০৯ সালে সংশোধিত গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এ যুক্ত করা হয়, যাতে রাজনীতিতে নারীর মর্যাদাপূর্ন অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়। নির্বাচন কমিশনের এ উদ্যোগ নিসন্দেহে রাজনৈতিক দলসমূহে নারীদের জন্য ক্ষমতার মূল স্রোতে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো লক্ষ পূরণের আর মাত্র ২ বছর বাকী থাকলেও বর্তমানে বেশীর ভাগ রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের কমিটিসমূহে নারীর ৩৩% (এক-তৃতীয়াংশ) প্রতিনিধিত্ব নেই।

সর্বশেষ কাউন্সিল শেষে কমিটি পর্যালোচনায় দেখা গেছে, গত আট বছরে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১৮ দশমিক ৫১ শতাংশ, বিএনপি ১৩ দশমিক ০৫ শতাংশ ও জাতীয় পার্টি ৮ দশমিক ৪৮ শতাংশ কোটা পূরণ করেছে। অন্যান্য দলগুলোর অবস্থা আরো খারাপ।

গত অক্টোবর ২০১৬ সালে আওয়ামী লীগের ২০তম কাউন্সিলে ঘোষিত ৮১ জনের কেন্দ্রীয় কমিটিতে নারী মাত্র ১৫ জন। দলটি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৪ দশমিক ৪৯ শতাংশ পিছিয়ে। দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনা। ১৪

সদস্যের সভাপতি মন্ডলীতে তিনজন নারী হলেন সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, মতিয়া চৌধুরী, সাহারা খাতুন। ৩১টি সম্পাদকীয় পদের মধ্যে নারীরা পেয়েছেন মাত্র ৫টি। তারা হলেন যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক দীপু মনি, কৃষি বিষয়ক সম্পাদক ফরিদুন্নাহার লাইলী, নারী বিষয়ক সম্পাদক ফজিলাতুন্নেছা ইন্দিরা, শিক্ষা ও মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক শামসুন্নাহার চাঁপা এবং স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক রোকেয়া সুলতানা। ২৮জন সদস্যের মধ্যে নারী মাত্র ৫ জন।

গত মার্চ ২০১৬ তে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল শেষে বিত্রনপির ৫২১ জনের বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটিতে নারী মাত্র ৬৮ জন। দলের চেয়ার পারসন খালেদা জিয়া। নির্বাহী কমিটির ২০৯টি পদের মধ্যে নারী ২৩ জন। তাদের মধ্যে ভাইস-চেয়ারম্যান রাবেয়া চৌধুরী ও সেলিমা রহমান। জাতীয় নির্বাহী কমিটির ২৯৩ জন সদস্যের মধ্যে নারী ৪৪ জন।

প্রথম সারির দলগুলোর মধ্যে নারী নেতৃত্বের বিবেচনায় জাতীয় পাটির বর্তমান অবস্থান খুবই নাজুক। এবারের সম্মেলন শেষে কেন্দ্রীয় কমিটিতে ৩৭৭ জনের মধ্যে নারী ৩২ জন।

গত অক্টোবর ২০১৬ এ অনুষ্ঠিত সিপিবির একাদশ কংগ্রেসে দেখা যায় ৪৫ জনের কেন্দ্রীয় কমিটিতে নারী মাত্র ৬ জন। অর্থাৎ ১৩ দশমিক ৩৩ শতাংশ পদে নারীরা রয়েছেন।

গত মার্চ ২০১৮ তে অনুষ্ঠিত সম্মেলন শেষে সরকারের শরীক দল জাসদের সাধারন সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছে শিরীন আক্তার । পর্যালোচনায় দেখা গেছে, ১৩৯ সদস্যের কমিটিতে নারী আছে মাত্র ১৩ জন, শতাংশের হিসেবে যা ১১ দশমিক ৯২।

বড় দুটি দলে তুলনামূলক নারীদের অবস্থান বিশ্লেষনে দেখা যায়, ক্ষমতাসীন দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পেসিডিয়াম সদস্য পদে ১৭ জনের মধ্যে মাত্র চারজন এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) স্থায়ী কমিটির সদস্য পদে ১৯ জনের মধ্যে মধ্যে মাত্র একজন নারী। আওয়ামী লীগের ৪০ সদস্যের উপদেষ্টা পরিষদের মধ্যে মাত্র নারী আছেন দুইজন। অন্য দিকে ৭৩ সদস্য বিশিষ্ট বিএনপির উপদেষ্টা পরিষদের মধ্যে মাত্র ছয়জন নারী রয়েছে।

আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে সাংগঠনিক সম্পাদক পদে আটজনের মধ্যে একজনও নারী নেই। অন্যদিকে বিএনপিতে একই পদে ১০ জনের মধ্যে নারী আছেন মাত্র দুইজন। আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক পদে চার জনের মধ্যে নারী আছেন একজন। কিন্তু বিএনপিতে একই পদে আট জনের মধ্যে কোন নারী নেই। আওয়ামী লীগের ৮১ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কার্য নির্বাহী কমিটিতে নারী আছেন মাত্র ১৫ জন, আর বিএনপিতে ৫০২ সদস্যের কমিটির মধ্যে নারী আছেন ৬৫ জন।

২০২০ সাল পূর্ন হতে আর বাকী আছে দুই বছরেরও কম সময়। এই অবস্থায় রাজনৈতিক দলসমূহে এক-তৃতীয়াংশ নারীর প্রতিনিধিত্ব রাখার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান জানতে চেয়ে নির্বাচন কমিশন থেকে তাদের চিঠি দেয়া হয়। ৪০টি দলের মধ্যে ১০টি দল নারীদের দলের অবস্থান সম্পর্কে ইসিকে অবহিত করেন। দলগুলোর দেয়া প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে ৪০টি নিবন্ধিত দলের মধ্যে একটিমাত্র দল (গণফ্রন্ট) তাদের দলে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করেছে। প্রতিবেদন থেকে আরও দেখা যায়, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্য নির্বাহী কমিটির ৮১ জনের মধ্যে ১৫ জন নারী, শতকরা হারে তা ১৮ শতাংশ। বিএনপির সব স্তরের কমিটিতে ১৫ শতাংশ নারী সদস্য রয়েছে। আর জাতীয় পার্টির সকল পর্যায়ের কমিটিতে নারী রয়েছে ২০ শতাংশ (বিডি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম, ১৮ মার্চ ২০১৮)।

সাম্প্রতিক স্থানীয় সরকার আইনের পরিবর্তন ও নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ ঃ

সাম্প্রতিক স্থানীয় সরকার আইনের পরিবর্তনের পূর্বে বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ছাড়া সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনগুলো নির্দলীয়ভাবে হয়েছে। কিন্তু বিগত কয়েকেটি নির্বাচনের অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে যে, আইনে নির্দলীয় হলেও বাস্তবে স্থানীয় সরকারের নির্বাচন হচ্ছে দলীয় মনোনয়নের মাধ্যমে। একমাত্র প্রতীক ছাড়া আর সব কিছুই হয়েছে দলীয় ভিত্তিতে। এছাড়াও দলগুলো প্রার্থীদের মনোনয়ন দেয়ার পাশাপাশি নির্বাচনে তাঁদের দলের কতজন জয়ী হলো, তাও প্রকাশ করেছে। এমতাবস্থায় সরকার ২০১৫ সালের শেষদিকে স্থানীয় সরকার নির্বাচন নির্দলীয়ভাবে করার পরিবর্তে দলীয় মনোনয়ন ও প্রতীকের মাধ্যমে করতে আইন, প্রণয়ন করে। আইনগুলো পাস হওয়ার পর নির্বাচন কমিশন এ সংক্রান্ত নীতিমালা তৈরি করে। সংশোধনী অনুযায়ী, পাঁচ বছরের নির্দিষ্ট মেয়াদ পূরণের পর কোনো কারণে নির্বাচন না হলে প্রশাসকের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করতে হবে। নির্বাচনে মেয়র, চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের দলীয় মনোনয়ন ও দলীয় প্রতীক থাকতে হবে। নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত ৪০টি দলের পক্ষ থেকে প্রার্থী হওয়ার সুযোগ থাকবে। স্থানীয় নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ রাখা হলেও তাঁদের জন্য বিধি ঠিক করে নির্বাচন কমিশন।

১। আইনগুলো হচ্ছে: স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) সংশোধন আইন, ২০১৫; উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১৫; জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১৫; স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) সংশোধন আইন, ২০১৫ এবং স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) সংশোধন আইন, ২০১৫।

সার্বিকভাবে নারীদের অগ্রগতি-উন্নতি সত্ত্বেও রাজনীতিতে চলছে উল্টোযাত্রা। সেখানে নারী ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছেন। বিষয়টি আরও উদ্বেগজনক এ কারণে যে রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়নের এই অবনমন! বিষয়টি গভীরভাবে ভাবা হচ্ছে না। বিগত স্থানীয় সরকার (উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ ও জেলা পরিষদ) নির্বাচনসমূহ কতটা নিরপেক্ষ ও পক্ষপাতমূলক হয়েছে, সে বিতর্কে না গিয়েও বলা যায়, এটি ৯৯ শতাংশ পুরুষতান্ত্রিক নির্বাচন হয়েছে। পরিসংখ্যান তা-ই বলে। তবে এই হিসাবে নারীর জন্য যে এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষিত সদস্য পদ রাখা হয়েছে, সেটি ধরা হয়নি। গবেষনার তথ্য অনুযায়ী, ১৯৯৭ সালের ইউপি নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে নারী প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১০২ জন। জিতেছিলেন ২৩ জন। ২০০৩ সালে ২৩২ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জিতেছিলেন ২২ জন। ২০১১ সালের নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন ২২৬ জন। জয়ী হন ২৩ জন। পত্রিকার সূত্র মতে, ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চার হাজার ইউনিয়ন পরিষদে মাত্র ২৯ জন নারী চেয়ারম্যান পদে বিজয়ী হয়েছেন।

১৯৯৭ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ১৩ হাজার ৫০০ পদে এক লাখ ৮০ হাজার নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ২০০৩ সালের নির্বাচনে তা কমে দাঁড়ায় এক লাখ ২৪ হাজার জনে। সর্বশেষ ২০১১ সালের নির্বাচনে তা আরও কমে দাঁড়ায় মাত্র ৯০ হাজার জনে। মাত্র ১৫ বছরের ব্যবধানে নারীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ৫০ শতাংশ কমে গেছে। সংরক্ষিত আসনের ক্ষেত্রে ১৯৯৭ সালে আসন প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৪ জন, ২০০৩ সালে ৩.১০ জন, ২০১১ সালে তা দাড়ায় ২.৯ জনে এবং ২০১৬ সালে এ হার আরো কমে যায়।

খান ফাউন্ডেশন ও সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত 'উপজেলা পরিষদ নির্বাচন ২০১৪ :নারীর প্রতিনিধিত্ব' শীর্ষক সেমিনারের ধারণাপত্র মতে, ২০০৯ সালের উপজেলা নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী নারী প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল ২,৯০০ জন। এই হিসাব অনুযায়ী প্রতি উপজেলায় গড়ে ৭ থেকে ৯ জন নারী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ২০১৪ সালের ৪৫৮টি উপজেলা নির্বাচনে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১৫০৭ জনে। এই হার গড়ে দাঁড়ায় ৩ থেকে ৪ জনে। মাত্র ৫ বছরে উপজেলা নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ কমেছে ৪৮ শতাংশ।

নির্দলীয়ভাবে অনুষ্ঠিত ২০১০-১১ সালের পৌর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৪ জন ও বিএনপি ১২ জন নারী প্রার্থীকে সমর্থন দিলেও ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত পৌর নির্বাচনে অনেক কমে যায় সে সংখ্যা। দলীয় প্রতীকে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ পৌর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সাতজন এবং বিএনপি মাত্র একজন নারীকে মনোনয়ন দেয়। তবে কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর পদে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৫৪ শতাংশ আওয়ামী লীগ, ৩৩ শতাংশ বিএনপি এবং ১১ শতাংশ নারী অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন।

অথচ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ৯০বি ধারায় বলা আছে, ২০২০ সালের মধ্যে রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটিসহ সব স্তরে ৩৩ শতাংশ নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধন নেওয়ার সময়ও রাজনৈতিক দলগুলো কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।
বাংলাদেশের বিগত সরকারগুলোর ঘোষিত নীতি-পরিকল্পনায় নারীর উন্নয়ন বা ক্ষমতায়নের কোনরূপ ছাপ দেখতে পাওয়া যায় না। আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৭ সালে, অর্থাৎ আজ থেকে ১৯ বছর আগে একটি নারী উন্নয়ন নীতিমালা করেছিল। সেবারে তারা বাস্তবায়ন করতে পারেনি। ২০০৯ সালে ক্ষমতায় এসে তারা নারী উন্নয়ন নীতিমালা পুনর্বহালের কথা বললেও তাদের মেয়াদের শেষ প্রান্তে এসেও তা কার্যকর হয়নি। এ নিয়ে এখন আর কেউ উচ্চবাচ্য করছেন না। তারা রূপকল্প-২০২১ ঘোষণা করেছে। নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার কৃতিত্ব দাবি করছে। কিন্তু নারীর উন্নয়ন বা ক্ষমতায়ন নিয়ে কোনো রূপকল্প দেখি না। ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে আওয়ামী লীগ বলেছিল, জাতীয় সংসদে মহিলা সংরক্ষিত আসন ৩৩ শতাংশে উন্নীত করবে। কিন্তু করেনি। বিএনপির আমলের চেয়ে মাত্র পাঁচটি আসন বাড়িয়েছে। ওই ইশতেহারে 'নারীর ক্ষেত্রে যেসব বৈষম্যমূলক আইন' আছে, সেসব সংশোধনের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে কিছুই করেনি। এসকল ক্ষেত্রে অন্যতম বড় দল বিএনপির উদ্যোগগুলোও উল্লেখ করার মত নয়।

এবারের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নারীর প্রতিনিধিত্ব কম হওয়ার কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে রাজনৈতিক দলগুলোর কেন্দ্রীয় অনেক নেতা বলেছেন, তৃণমূল থেকে নাম আসেনি বলেই তাঁরা নারীর প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে পারেননি। নাম আসবে কীভাবে? যাঁরা নাম পাঠাবেন অর্থাৎ তৃণমূলের নেতৃত্বে তো গত দুই আড়াই দশকে কোনো পরিবর্তন আসেনি। নির্বাচনে নারীর প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে হলে আগে দলে প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে হবে। এখানে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কথা উল্লেখ করেছি। বাম-মধ্য, ছোট-বড় সব দলেই পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা প্রকট। আর ডানপন্থীরা তো কখনোই চায় না নারীরা রাজনীতিতে আসুক।

বর্তমানে নির্বাচনী বিধি-ব্যবস্থায় পরিবর্তন অর্থাৎ দলীয় মনোনয়নের ভিত্তিতে নির্বাচন প্রবর্তনের ফলে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ তথা ক্ষমতায়নের পথে নতুন নতুন অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছে। দলীয় প্রতীকে অনুষ্ঠিত নির্বাচনকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় রাজনৈতিক দল ও দলের নেতারা অনেক বেশী প্রভাবকের ভুমিকা পালন করছে এবং নির্বাচনে পরিবার ও সমাজের ভূমিকা এবং আর্থ অবদানকারী কারণ হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। সামাজিক শক্তিগুলোর স্থলে রাজনৈতিক শক্তিগুলো জায়গা করে নিচ্ছে। মনোনয়ন প্রদানের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি, চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী কর্তৃক প্যানেল গঠন, প্রাথীতার প্রক্রিয়ায় জটিলতা, নির্বাচনী ব্যয় বৃদ্ধি, দলীয় নেতাদের ঘুষ বাণিজ্য, স্থানীয় প্রশাসনের অসহযোগিতা, অসম্মানজনক নির্বাচনী প্রতীক, রাজনৈতিক দল বা প্রতিপক্ষ কর্তৃক মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের চাপ প্রয়োগ, চেয়ারম্যান ও সাধারণ আসনে নারী প্রার্থীদের মনোনয়ন প্রদানে রাজনৈতিক দলের অনীহা ইত্যাদি নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথে প্রধান অন্তরায় । অন্যান্য উল্লেখযোগ্য অন্তরায়গুলো নিম্নরূপ ঃ

- চেয়ারম্যান, পরিষদ সদস্য (সাধারণ ও সংরক্ষিত) পদে প্যানেলের ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ;
- প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্থানীয় সংসদ সদস্য ও দলীয় পদাধিকারীদের প্রভাব বৃদ্ধি;
- নির্বাচনে মনোনয়ন বাণিজ্য বেড়ে যাওয়া;

- রাজনৈতিক সংঘাত ও আন্তঃদলীয় কোন্দাল বৃদ্ধি;
- রাজনৈতিক দল ও পরিবার কর্তৃক সাধারণ আসনে বা ক্ষেত্র বিশেষে সংরক্ষিত আসনে প্রার্থী না হওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ (বিশেষতঃ বিরোধী দলীয় বা নিজ দলের বিদ্রোহী প্রার্থীর ক্ষেত্রে);
- অধিকাংশ পরাজিত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে প্রচারণা ও ভোট চলাকালীন সময়ে প্রতিপক্ষ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার অভিযোগ;
- পোলিং এজেন্টদের কেন্দ্রে প্রবেশ করতে না দেওয়া বা কেন্দ্র হতে বের করে দেয়ার ঘটনা বৃদ্ধি;
- পুরুষ সহকর্মীদের নেতিবাচক প্রচারণার শিকার;
- পূর্বের তুলনায় প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি যেমন: নারীদের জন্য TIN বাধ্যতামূলক ও দলীয় সমর্থনে মনোনয়ন;

জাতীয় সংসদ থেকে স্থানীয় সরকারের সব স্তরেই সংরক্ষিত আসনের মাধ্যমে একধরনের বৈষম্য তৈরি করা হয়েছে। ৩০০ আসনে নির্বাচিত সাধারণ সংসদ সদস্যদের নির্ধারিত নির্বাচনী এলাকা আছে, এলাকার ভোটাররা তাঁদের কাছে দাবি-দাওয়া জানাতে পারেন। তাঁরাও ভোটারদের কাছে ভোট চাইতে পারেন। কিন্তু সংরক্ষিত আসনের নারী সাংসদ সদস্যরা কার প্রতিনিধিত্ব করছেন, সেটি স্পষ্ট নয়। স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর সংরক্ষিত সদস্য কিংবা ভাইস চেয়ারপারসনদের অবস্থা আরও করুণ। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন চাইলে এই বৈষম্যের অবসান হওয়া প্রয়োজন। স্থানীয় সরকারসহ সব জনপ্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত আসনের মাধ্যমে নারীর প্রতীকী ক্ষমতায়ন করা হয়েছে। কিন্তু আমরা যদি রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনায় নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন চাই, তাহলে সমসংখ্যক আসনে তাঁদের নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। এবং সেটি অবশ্যই সমতার ভিত্তিতে।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ/প্রতিনিধিত্ব ঃ

স্বাধীনতার পর প্রথম সংসদ নির্বাচনে কোন নারী সরাসরি ভোটে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হতে না পারলেও পরের নির্বাচনে দুজন নির্বাচিত হয়েছিলেন। বর্তমান সংসদে ৭২ জন (সাধারন আসনে ২২ জন ও সংরক্ষিত আসনে ৫০ জন) নারী সদস্য রয়েছেন।

১৯৭৩ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সাধারন আসনে নারীদের অবস্থার সংখ্যাগত তথ্য বিশ্লেষণ করা হলো

নির্বাচন সময়কাল	রাজনৈতিক দলের সংখ্যা	সাধারন আসন সংখ্যা	মোট প্রার্থীর সংখা	পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা	নারী প্রার্থীর সংখ্যা	পুরুষ প্রার্থীদের জয়ের সংখ্যা	নারী প্রার্থীদের জয়ের সংখ্যা	পুরুষ প্রার্থীদের জয়ের অনুপাত(%)	নারী প্রার্থীদের জয়ের অনুপাত (%)
১৯৭৩-৭৫ (১ম)	১৪	৩০০	১০৭৮	১০৭৬	২	৩০০	০	১০০	০
১৯৭৯-৮২ (২য়)	২৯	৩০০	২১২৭	২১১০	১৭	২৯৮	২	৯৯.৩	০.৭
১৯৮৬-৮৭ (৩য়)	২৮	৩০০	১৫২৭	১৫০৬	২১	২৯৭	৩	৯৯.০	১.০
১৯৮৮-৯০ (৪র্থ)	৮	৩০০	৯৭৮	৯৭১	৭	২৯৬	৪	৯৮.৭	১.৩
১৯৯১-৯৫ (৫ম)	৭৫	৩০০	২৩৬৩	২৩১৬	৪৭	২৯৫	৫	৯৮.৩	১.৭
১৯৯৬-৯৬ (৬ষ্ঠ)	৪১	২৮৯	৯৯৩	৯৮৬	৭	২৮৬	৩	৯৯.০	১.০
১৯৯৬-০১ (৭ম)	৮১	৩০০	২৫৭৪	২৫২৩	৫১	২৯২	৮	৯৭.৩	২.৭
২০০১-০৬ (৮ম)	৫৪	৩০০	১৯৩৯	১৮৯০	৪৯	২৯২	৭	৯৭.৭	২.৩
২০০৯-১৪(৯ম)	৩৮	৩০০	১৫৬৭	১৫০২	৬৫	২৭৯	২১	৯৩.০	৭.০
২০১৪ - (১০ম)	১২	৩০০	৫৪১	৫১১	৩০	২৭৮	২২	৯২.৭	৭.৩

উপরের তথ্য অনুযায়ী দেখা যায়